সমকালের গূঢ় পদচিহ্ন

‘বেঙ্গল বিয়ন্ড বাউন্ডারিজ়’ শীর্ষক প্রদর্শনীটি প্রকৃতপক্ষে ইতিহাসের অভিঘাতের এক ধারাবাহিক বিবরণ।

চিত্রকলা
অনুরাধা ঘোষ

সম্প্রতি নয়া দিল্লির বিকানির হাউসে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বিশালাকার একটি প্রদর্শনী– ‘বেঙ্গল বিয়ন্ড বাউন্ডারিজ়’, কলকাতার আকৃতি আর্ট গ্যালারির উদ্যোগে। শিরোনাম থেকেই পরিষ্কার হয়ে যায় যে, এই প্রদর্শনীর বিষয় বাংলার শিল্প ও শিল্পীরা; এই প্রদেশের প্রায় কয়েক শতকের শিল্পসৃষ্টি, তাদের ইতিহাস-অনুগ পর্বভাগ, এবং ভিন্নমুখী বিবিধ শিল্পধারার বিন্যাস একটি একক ছাতার তলায় নিয়ে আসার কাজটি যথেষ্ট দুরূহ, সেখানে শিল্পতাত্ত্বিক, ইতিহাসবিদ ও কলা-গবেষকের সক্রিয় সংযোগ দরকার হয়। এই কঠিন কাজটি অত্যন্ত সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন করার জন্য গ্যালারির কর্ণধার বিক্রম বাচাওয়াত ও কিউরেটর উমা নায়ার আমাদের ধন্যবাদার্হ হবেন। বলা বাহুল্য, এই প্রদর্শনীর কালপরিধি সুবিশাল– তা শুরু হয়েছে আর্লি বেঙ্গল স্কুল ও কোম্পানি স্কুলের ছবি থেকে, শেষ হচ্ছে একেবারে সাম্প্রতিক নবীন শিল্পীদের কাজে। শুধু সাহিত্যে নয়, শিল্পেও নিহিত হয়ে থাকে সমকালের গূঢ় পদচিহ্ন, একদিন তা ইতিহাস হয়ে যায়; শিল্প মূলত সঙ্কেতনির্ভর বলেই হয়তো এই ইতিহাসের চরিত্র কিছুটা আলাদা, সেখানে অনুপ্রবিষ্ট হয় একটা ব্যক্তিগত অনুবাদের এলাকা, তা শিল্পীর, দর্শকেরও। বিকানির হাউসের দু’টি আলাদা ভবনের উপর-নীচ জুড়ে প্রদর্শিত ছবিগুলি খুঁটিয়ে দেখে মনে হয়েছে, এই শো প্রকৃতপক্ষে ইতিহাসের অভিঘাতের এক ধারাবাহিক বিবরণ, যা মেনস্ট্রিম ইতিহাসের সমান্তরালে এগোলেও খুলে রাখে তার সঙ্গে প্রশ্নোত্তরপর্বের বিবিধ এলাকা। ফলে শুধু ছবি দেখা নয়, শিল্প-মুহূর্তের সঙ্গে একান্ত ও আনন্দিত সংযোগও নয়, এই অভিজ্ঞতার সঙ্গে অবধারিত যুক্ত হয়ে থাকে এক সামূহিক অতীতের বোধ। মনে রাখতে হবে, এখানে সবচেয়ে প্রাচীন যে-ছবিগুলি দেখছি, সেগুলির সৃষ্টিও একটা ঔপনিবেশিক বাতাবরণের মধ্যে। ঔপনিবেশিকতার বিবিধ স্তর পেরিয়ে উত্তর-ঔপনিবেশিক (এবং অবশ্যই উত্তর-আধুনিক) আবহে পৌঁছোনোর যে-যাত্রাপথ, শিল্পীদের সতত পরিবর্তনশীল পরিচয়চিহ্ন তার সঙ্গে দৃঢ়নিবদ্ধ হয়ে রয়েছে। ছবির মধ্যে নিহিত সেই সব সঙ্কেতের বিনির্মাণ আমাদের ইতিহাসবোধের সারল্যকে দোলাচলের মধ্যে ফেলে দেয় কখনও-কখনও।

যেমন, কোম্পানি স্কুল ও আর্লি বেঙ্গল পেরিয়ে আমরা যখন কালীঘাটের পটের কাছে পৌঁছোই, ততক্ষণে পরিষ্কার হয়ে যায় কী ভাবে স্থান ও কালের সংলাপ অধিকার করে রাখে শিল্পীর আত্মপ্রকাশকে। মনে রাখতে হবে এই শিল্পীরা প্রায় সকলেই নামহীন। এ দেশে শিল্পের সামাজিক মাহাত্ম্য তখনও সামান্যই, ফলে সৃষ্টির মালিকানা নির্দিষ্ট করার বিষয়টি গৌণ ছিল বললেই চলে (যদিও ভারতে আসা ড্যানিয়েল ব্রাদার্স বা উইলিয়াম হজেস-এর মতো ব্রিটিশ শিল্পীরা স্বনামেই খ্যাত ছিলেন)। আজও অবশ্য অধিকাংশ লোকশিল্পী আমাদের কাছে অদৃশ্যই থেকে যান। সদ্যপ্রতিষ্ঠিত কালীঘাট মন্দিরের পুণ্যার্থীরা সেখান থেকে বহু পট কিনে নিয়ে যেতেন, ফলে চাহিদার জোগান দিতে পটুয়াদের দ্রুত শেষ করতে হত ছবি– সেখান থেকেই সৃষ্টি সেই বেগবান 'কালীঘাট লাইন', যে-রেখাকে প্রায় শতাব্দ পেরিয়ে নিজের ছবিতে যামিনী রায় ফিরিয়ে আনলেন আবার। তার সঙ্গেই মিলে গেল তাঁর আধুনিক ইউরোপীয় শিল্প থেকে অর্জিত সিগনিফিকেন্ট ফর্মের বোধ, নিজের মতো ভাঙাগড়া করে তিনি যুক্ত হয়ে থাকলেন বাংলার লোকশিল্পের আবহটির সঙ্গে! অথবা, স্বাদেশিকতা-উদ্দীপিত নিও-বেঙ্গল স্কুলের (এখানে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার ও মুকুল দে-র ছবি রয়েছে) পৌরাণিক বিষয় সম্পর্কে ঝোঁক হয়তো যুক্ত করে দেখা যায় আর্লি বেঙ্গল স্কুলের দেবদেবী ও পুরাণ-নির্ভর ছবিগুলির সঙ্গে, যদিও এই দুই চিত্রধারার প্রকরণ ও প্রয়োগ সম্পূর্ণ আলাদা।

শিল্পের এই যে অ-সরলরৈখিক দেওয়া-নেওয়া, সে সব দৃশ্যত উপস্থিত হয় এই প্রদর্শনীতে, ছবিগুলি কাছাকাছি থাকার কারণে। এও এক যথেষ্ট জরুরি প্রাপ্তি। তবে নিও-বেঙ্গল স্কুলের প্রাচ্যশৈলীর একেবারে বিপ্রতীপে যে একাডেমিক বাস্তববাদী চিত্রধারা অব্যাহত এবং খ্যাত ছিল সেই সময়, একমাত্র হেমেন মজুমদার ছাড়া তার আর কোনও প্রতিনিধি নেই। তবে হেমেন মজুমদারের জলরঙের অসামান্য প্রতিকৃতিটি আমাদের বুঝিয়ে দেয়, কেবলমাত্র সিক্তবসনাদের চিত্রী হিসেবে তাঁকে মনে রাখা আমাদের শিল্প-বিষয়ক অসচেতনতারই প্রমাণ। অবনীন্দ্রনাথের প্রিয় ছাত্র নন্দলাল বসু কলাভবনে শিক্ষকতাকালীন কী ভাবে পৌঁছে যাচ্ছেন অতিসাধারণ মানুষের জীবনের একেবারে সন্নিকটে, অবনীন্দ্র-অনুসারী ভারতীয় শৈলীর পূর্ববর্তী চর্চা ছেড়ে– তা চিনে নেওয়া যায় এখানে প্রদর্শিত তাঁর ছবিটিতে। নন্দলালের ছবির পাশাপাশি রামকিঙ্কর বেইজ-এর দু'টি ও বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের চারটি ছবি পরপর দেখলে শান্তিনিকেতনের কলাভবন-কেন্দ্রিক 'কনটেক্সচুয়াল মডার্নিজ়ম'-এর একটা ধারণা তৈরি হয়ে ওঠা সম্ভব। কে জি সুব্রমনিয়নের চারটি ছবি সেই ধারণাকে একটা প্রসারিত অর্থও দেয়। সেই সময়কার চিত্রচর্চার নিরিখে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবি যে একেবারে স্বতন্ত্র চিত্রপথের নির্দেশক ছিল, তাঁর কালিতুলির কাজটি প্রামাণ্য ভাবেই তা বুঝিয়ে দেয়। একেবারে কেন্দ্রিক কম্পোজিশনের এই মুখটি ছায়াচ্ছন্ন ও রহস্যময়, যেন সে অরূপরতনের রাজা, চেতন-অচেতনের মধ্যবর্তী অনির্দিষ্ট আঁধারে প্রোথিত তার উপস্থিতি।

দুর্ভিক্ষ, দেশভাগ ও নানাবিধ বিপন্নতার দশকগুলি শিল্পক্ষেত্রে শুধু যে যন্ত্রণার দাগ নিয়ে এসেছিল তা নয়, তার পাশাপাশিই সন্তর্পণে ছিল একধরনের প্রতিস্পর্ধাও। গোবর্ধন আশের 'রেবেল' নামের ছবিটি তো বটেই, সোমনাথ হোরের ন'-টি ছবিতেও এই মিশ্র যুগচিহ্ন লক্ষ করা যায়। দীর্ণ, ক্ষুধার্ত এবং সর্বার্থেই প্রান্তিক তাঁর এই চরিত্রদের যন্ত্রণার বিমূর্ত নির্যাস যেন প্রকাশ পেয়েছে এর মধ্যেই তিনটি পেপার পাল্প প্রিন্টে, যেগুলি তাঁর বিখ্যাত 'উল্ডস' সিরিজ়ের কাজ। বাংলার দুর্ভিক্ষ বলতেই আমাদের মনে পড়ে চিত্তপ্রসাদের কাজ, যদিও এখানে তাঁর ১৯৬৩ সালের যে-দু'টি ছবি ছিল তা একেবারে অন্য মেজাজের। তবে পরিতোষ সেন ও গোপাল ঘোষ ছাড়া ক্যালকাটা গ্রুপের কোর মেম্বারদের আর কারও কাজ সে ভাবে দেখা গেল না বলে দৃশ্যত মিলিয়ে দেখাও সম্ভব হল না তাঁদের ম্যানিফেস্টোর সেই জোরালো দাবি– 'আর্ট মাস্ট বি ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড ইন্টারডিপেন্ডেন্ট'। শ্যামল দত্তরায়ের 'ব্রোকেন বোল' সিরিজ়ের ছবিটি এবং অন্য চারটি ছবিও একটা ক্ষয়িষ্ণু সময়ের ভাষ্য মেলে ধরে। বিকাশ ভট্টাচার্যের 'স্যালভেশনিস্ট' ছবিতে একটা সন্ত্রাসের বাতাবরণের মধ্যে শিরোনাম-নির্দেশিত পরিত্রাণের প্রসঙ্গ যে আসলে তির্যকতাময়, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। যোগেন চৌধুরীর ছবিতেও এইরকম একটা অনির্দিষ্ট সন্ত্রাসের ইঙ্গিত রয়েছে। সেই আগ্রাসনের সুতো কখনও থাকে সময় ও সমাজের হাতে, কখনও-বা তার নিয়ন্ত্রক মানুষই। তাঁর 'ফেস ইন অ্যাগনি' ছবিটিতে মনুষ্যমুখে যে-ক্ষতচিহ্ন ও তার ওপর সেলাইয়ের দাগ দেখতে পাই, তা একটা আঘাত ও তার আংশিক নিরাময়ের কথা বলে। যে-যন্ত্রণা

অনতিক্রম্য, তা মেনে নিয়ে সেই একই যন্ত্রণাবৃত্তে পুনর্বাসন– আমাদের অধিকাংশের জীবনই এইরকম, এবং ছবির গহনে শিল্পীও সম্ভবত সেই নিয়তির কথাই বলতে চেয়েছেন।

যোগেন চৌধুরীর একটি নারীমুখের ভাস্কর্যও ছিল প্রদর্শনীতে। তাঁর ভাস্কর্য সচরাচর দেখা যায় না– যেমন দেখা যায় না লালুপ্রসাদ সাউ এবং সুহাস রায়ের ভাস্কর্যও, অথচ এই প্রদর্শনীতে সেগুলি দেখতে পেলাম। এও বড় কম পাওয়া নয়। আশি ও নব্বইয়ের দশকের শিল্পীদের ছবিতে দীর্ণতার কথন যে নেই তা নয়। অথচ তার মধ্যেই, ঠিক লিরিকের মতো একটা বিরামচিহ্ন নিয়ে, হঠাৎই ঢুকে পড়ে পেলব স্মৃতির ঝলক! স্মৃতিচিহ্নের মতো করে অতীতযাপনকে দেখেছেন ছত্রপতি দত্ত, তাঁর ছবিতে প্রায় ব্লেকের কবিতার মতো সমীপবর্তী হয়ে থাকে ইনোসেন্স ও এক্সপিরিয়েন্স, আশ্বাস ও আগ্রাসন। আদিত্য বসাকের চিত্রিত নারীরা মুণ্ডহীন, তাদের পোশাকও ভারী, তবু তাদের মধ্যে একটা অন্তর্গত উড়ান রয়েছে, যা গভীর ও গোপন। চন্দ্র ভট্টাচার্যর 'সাইলেন্স' নিরুপায় নীরবতার ছবি, যার মধ্যে রয়েছে বৈরী আবহের কাছে সমর্পণের চাপ। অথচ সেখানেও স্থূলরেখায় যে-অনির্দেশ্য নম্র প্যাটার্নটি অনুপ্রবিষ্ট করলেন শিল্পী, তা পেলব ও ছন্দোময়। কাউন্টারপয়েন্টের এই বিশিষ্ট ব্যবহার এই সময়কার শিল্পীদের কাজে বার বার দেখেছি– জীবনের বহুবিধ চলন একটি চিত্রমুহূর্তে মিলিয়ে দেওয়ার এই প্রচেষ্টা এঁদের একটা লক্ষণীয় চারিত্র বলে মনে হয়েছে।

বাংলার শিল্পে বিমূর্ততার ধারাটিও অনায়াসে অনুসরণ করা সম্ভব এই প্রদর্শনীতে। গণেশ হালুইয়ের দু'টি বিমূর্ত ল্যান্ডস্কেপেই কিছু মিনিমালিস্ট স্থানাঙ্ক তৈরি করে দেয় জমিন, আকাশ, এমনকি জলের এক বিস্তারিত বোধ, প্রায় একটা মানচিত্রের মতো। দৃশ্যসত্য পেরিয়ে তা সঞ্চারিত করে প্রকৃতির বিন্যাসের এক অন্যতর চেতনা। বাঁধন দাসের ছবিতে দেখি এক স্তিমিত অন্ধকারের উচ্চারণ, প্রায় একটা নিমগ্ন মেডিটেটিভ মুহূর্তের মতো তার অভিঘাত। সুনীল দে তাঁর 'ওয়াল' সিরিজের জন্য সুপরিচিত– এখানেও দেখছি যাপনের চিহ্নগুলি তিনি বিন্যস্ত করেছেন সময়ের দেওয়াললিখনের মতোই, পরতে পরতে– তা তৈরি হয়ে ওঠে ধীরে, অথচ নিশ্চিত ভাবে। প্রদীপ রক্ষিতের ছবিতেও দেখি শ্যালো স্পেস, গম্ভীর রং ও নিয়ন্ত্রিত বর্ণবিচ্ছুরণের খেলা। শমীন্দ্রনাথ মজুমদার তাঁর দু'টি ক্যানভাসেই স্পেস ডিভিশনের মধ্য দিয়ে ইতিহাসের চলনকে ধরতে চেয়েছেন। নিসর্গেরও যে একটা নিজস্ব ইতিহাস আছে, তা যে মানবসভ্যতার বিবর্তনের সমান্তরাল অথচ স্বতন্ত্র এবং স্বরাট, এই নিঃশব্দ উচ্চারণ ছড়িয়ে রয়েছে ছবির সর্বত্র, বিশেষত তাঁর 'দ্য রোড নট টেকেন' ছবিটিতে, তার বালিতে, জলরেখায়, প্রত্নযুগের পাথরেও।

কোনও কোনও খ্যাত শিল্পী অনুপস্থিত থাকলেও এই প্রদর্শনীর ঐতিহাসিক গুরুত্ব স্বীকার না করে উপায় নেই। এবং এখানে আরও একটা কথা বলে নেওয়া দরকার। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বাংলার সমকালীন শিল্প ও শিল্পীদের পরিচিতি যে আগের মতো নেই, তা মেনে নিতেই হবে আমাদের। তার কারণ নানাবিধ– এঁরা অনেকেই প্রচারবিমুখ, বিপণন সম্পর্কে নিরুৎসাহী– আর এখানে ছবির ব্যবসা সে ভাবে এখনও ফুলেফেঁপে ওঠেনি বলে প্রভাবশালী গ্যালারিগুলিও কলকাতায় সে ভাবে কাজ করেন না। ছবি কেনাবেচার যে-কর্পোরেট কালচার অন্যত্র দেখি, এখানে তার সামান্য অংশও তৈরি হয়ে ওঠেনি। আর সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বাংলার শিল্পীদের নিয়ে লেখার মতো জোরালো, কমিটেড লেখকের অভাব তো আছেই। প্রদর্শনী চলাকালীন দেখেছি, দিল্লির বহু দীক্ষিত দর্শকের কাছেও বাংলার বহু প্রতিষ্ঠিত শিল্পী অপরিচিত, প্রায় একটা আবিষ্কারের উৎসাহে তাঁরা সেই সব ছবি বহুক্ষণ ধরে দেখেছেন। জানা গেল, প্রদর্শনীর মূল ভাবনা ছিল যোগেন চৌধুরীর। এর জন্য তিনি নিশ্চিত ভাবেই আমাদের ধন্যবাদার্হ হবেন। এই প্রদর্শনী সামান্য হলেও পরিস্থিতির একটা বদল ঘটাবে, শিরোনামে যে-পরিধি লঙ্ঘনের কথা বলা হয়েছে, প্রকৃত প্রস্তাবে ঘটে যাবে তা, এমনটাই আশা করা যাক।